Rashmonir Sonadana by Somoresh Majumder

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum

suman_ahm@yahoo.com

রাসমণির সোনাদানা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সন্ধেবেলা বেরোবে বলে চুল আঁচড়াচ্ছিল রাঙা। আয়নার সামনে দাঁড়ালে বরাবর তার মন ভাল হয়ে যায়। অনেকে বলে তার মুখশ্রীতে একটা ধ্রুপদী আদল আছে। যেমনটা পটচিত্রে বা ঠাকুরদেবতার ছবিতে দেখা যায়। খুব নিখুঁত গড়নের মুখ। সরু চিবুক, ছোট কপাল, পাতলা ঠোঁট, থুঁতনিতে একটা আবছা খাঁজ, গালে টোল এবং চোখ। হ্যাঁ, তার চোখ নাকি অনেকের সর্বনাশ করে বসে আছে। এতটা নিখুঁত হওয়া কি ভাল? তার নিজের তো বাপু তেমন পছন্দ নয় ব্যাপারটা। বরং একটু লম্বাটে মুখ হলে সে খুশি হত। একটু খুঁত-টুত থাকা কিছু খারাপও তো নয়। একটু খুঁত সৌন্দর্যকে বরং কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। তবু আয়নার সামনে দাঁড়ালে তার খুশি হওয়ার কারণ আছে।

খুব মন দিয়ে একদম কপালের মাঝখানে একটা লাল টিকলি পরছিল সে। ঠিক সেই সময়ে আয়নায় তার পিছনে একটা চকিত সাদা রঙের ঝলক যেন উদ্ভাসিত হয়েই সরে গেল। ভারি অবাক হয়ে ঘাড় ঘোরালো রাঙা। ঘর ফাঁকা, দরজা বন্ধ। কেউ কোথাও নেই। তবে কি ভুল দেখল? না কি এই বয়সেই চোখের দোষ হল তার! স্পষ্ট দেখেছে।

ঘরখানা মস্ত বড়। একখানা সেকেলে বিশাল কারুকাজ করা পালঙ্ক। সাবেক আমলের মেহগনি কাঠের কয়েকটা আলমারি, ব্রিটিশ আমলের নামি দোকানের থ্রি পিস আয়নাওলা ড্রেসিং টেবিল, গরম জামাকাপড় রাখার জন্য বড় চেস্ট অফ ড্রয়ার্স। এই ঘরে থাকতেন রাসু ঠাকুমা। সম্পর্কে তার বাবার পিসি। বালবিধবা। এখনও পশ্চিমের দেয়ালে রাসমণির একখানা রঙিন ব্রো আপ করা ফটো বাঁধানো আছে কারুকার্যময় ফ্রেমে। এ ঘরে সেই কোন আদ্যিকালের গন্ধ যেন এখনও বিদ্যমান। আর ফটোর ওই মুখখানা, ও মুখ যেন রাঙার সঙ্গে অদল বদল করা যায়।

দেশ থেকে কিছুদিন আগেই তাদের বিস্মৃত অতীতের এক বুড়োমানুষ এসেছিল দেখা করতে। পূর্ব পাকিস্তানের নানা অসুবিধের কথা বলছিল বসে। হাপরহাটি, খানসেনা, রাজাকার এসব কথা কানে এসেছিল রাঙার। দেশ নিয়ে বাপ-জ্যাঠাদের ভীষণ আবেগ আছে এখনও। রাঙার নেই। তার জন্ম এদেশে, পার্টিশনের অনেক পরে। সেই বুড়ো লোকটার সামনে দিয়েই যখন সে কলেজে যাবে বলে বেরোচ্ছিল, তখন লোকটা হঠাৎ বড় বড় চোখে চেয়ে আর্তনাদের গলায় বলে উঠেছিল, আরে, এ যে

রাসু ঠাইরেন! এক্কেরে রাসু ঠাইরেন!

রাঙা চমকায়নি, তাকে আর রাসমণিকে নিয়ে এ বাড়িতে একটা চাপা ফিসফাস আছে। প্রকাশ্যে কেউ তাকে কিছু বলে না। কিন্তু বাড়ির লোকের ধারণা, রাসমণিরই পুনর্জন্ম ঘটেছে রাঙার মধ্যে।

ওসব অবশ্য রাঙা মানে না। এক বংশে একরকম দেখতে দুটো মানুষ জন্মাতেই পারে। এসব জিন-এর ব্যাপার। পুনর্জন্ম-টন্ম সে বিশ্বাস করে না। তবে সে বুঝতে পারে, তাকে রাসমণির পুনরাবির্ভাব ভেবে এবাড়ির লোকেরা একটু ভয়ও পায় যেন। এটার কোনও স্পষ্ট প্রকাশ নেই। তবে রাঙা টের পায় এবং ব্যাপারটা উপভোগও করে। বাড়ির লোক বলতে অবশ্য তার মা বাবা, ছোট ভাই জয়, আর কাকা কাকিমা। কাকা কাকিমার ছেলেপুলে নেই। আর যারা আছে তারা কিছু জ্ঞাতি, কিছু আশ্রিত, পূর্ববঙ্গে তাদের বাড়িতে এরা থাকত। এখনও আছে।

এই যেমন রাখালকাকা। এক সময়ে এ বাড়ির কাজের লোক ছিল। তার তিন কুলে কেউ নেই। এখন বুড়ো হয়েছে। দীর্ঘকালের অধিকারবোধ থেকে সে এখন এ বাড়ির একজন অভিভাবক গোছের। আছে নবদাদু আর ঠাকুমা। নবদাদু হল রাঙার ঠাকুর্দার পিসতুতো ভাই। কোন সূত্রে যে এসে পড়েছিল এ বাড়িতে কে জানে! কিন্তু রয়ে গেছে। আছে শ্যামাপদ জেঠু, আত্মীয় নন, একসময়ে তাদের এস্টেটে আদায় উসুলের কাজ করতেন। পরিবারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চলে এসেছেন। তিনি কাজের লোক, এ বাড়ির বাগানখানা তাঁর হাতের গুণেই ভারি দেখনসই হয়েছে। এদের মাঝখানেই বড় হয়েছে রাঙা। এদের কাউকে পর বলে মনে হয়নি কখনও। ঘাড়ে বসে খায় বলে মা বাবা বা কাকা কাকিমা কখনও অনুযোগ করে না। দেশের বাড়িতে এরকম আরও অনেক লোক খেত, থাকত। এ পরিবারের ঐতিহ্যই তাই। তবে পাকিস্তান থেকে চলে আসবার পর ঠাঁটবাট বজায় রাখতে একসময়ে সর্বস্বান্ত হতে বসেছিল তারা, এ গল্পও শুনেছে রাঙা। আরও একজন আছে এ বাড়িতে। তার নাম বেণু। রাঙার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। তার ঠাকুর্দা এ বাড়ির বুড়ো কর্তার খাস চাকর ছিল। সা জোয়ান চেহারা। শোনা যায় তার অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। কারও কারও সন্দেহ তাকে মেরেছিল বুড়োকর্তার পাইকরাই। বেণু এ বাড়ির আশ্রিত এবং চাকরের নাতি বলে তার সামান্য হীনম্মন্যতা আছে। তবে এ বাড়ির পরবর্তী প্রজন্ম তাকে দুরছাই করেনি, গতরেও খাটায়নি। বেণু লেখাপড়া শিখেছে। ছাত্র আন্দোলন করে। একটু আধটু পলিটিকসও। তবে মাঝে মাঝে সে কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। তার জন্য বকুনিও খায় খুব। মৃদু মৃদু মিষ্টি হাসি হেসে বকুনি টকুনি সব হজম করে নেয়। রাঙা জানে, বেণু দেখতে নরম সরম লাজুক প্রকৃতির হলেও ভারি জেদি। বেশ সাহসীও। এই মফস্বল শহরে সে ছেলেছোকরাদের পাণ্ডা গোছের লোক। ক্লাব, পুজো কমিটি, নাগরিক কমিটি সবতাতেই সে অপরিহার্য।

তিনতলা থেকে নামবার সময় আজ সন্ধেবেলা একটু আনমনা লাগছিল রাঙার। তিনতলাটা একদম ফাঁকা। চারটে ঘর, দরদালান, স্টোর রুম, ওপেন টেরাস নিয়ে কম জায়গা নয়। এ তলাটায় রাঙা ছাড়া কেউ থাকে না। আর একা এই পুরো একটা ফ্লোর নিয়ে থাকাটা রাঙার ভারি পছন্দ। গত চার বছর ধরে সে এখানে আছে। শোওয়ার ঘর ছাড়াও আছে স্টাডিরুম আর লাইব্রেরি, আর একটা ঘর নিজের মনের মতো সাজিয়ে সে ড্রয়িং রুম করেছে, বন্ধুবান্ধব এলে হই-হই করে আড্ডা হয়। চতুর্থ ঘরটায় একটা নিজস্ব জিম করার ইচ্ছে আছে। তবে আপাতত তাতে ডাই হয়ে আছে সাবেক আমলের বেশ কিছু বাড়তি অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

একতলায় নেমে সে মায়ের ঘরের দরজার সামনে একটু দাঁড়ায়। সরযূবালা এই ভরসন্ধেবেলাতেও চোখে চশমা এঁটে একটা লম্বা ফর্দ দেখছিল। এই মহিলাকে রাঙা কখনও অলস সময় কাটাতে দেখেনি জ্ঞান হয়ে অবধি। সরযূবালা প্রতাপশালী মহিলা নয়। ডাকসাইটে নয়। তার হাঁকডাক, তর্জন গর্জন কখনও কেউ শোনেনি। বরং মিষ্টি মুখশ্রীর এই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা মহিলাটি শ্বশুর শাশুড়িদের কাছে নতমুখেই থাকত। কিন্তু রাঙা মাকে চেনে। অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে তার মায়ের কোনও তুলনাই হয় না। সরযূবালাই এই পরিবারটিকে নিঃস্ব ভিখিরি হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। সকলের অমতে খুলেছিল শাড়ির দোকান। রাসমণির দোকান, এই শহরে আজও এত গুডউইল আর কারও নেই। রাসমণির দোকান হল রিটেল আউটলেট। সরযূবালা সেই সঙ্গে পাইকারি ব্যবসাও চালু করেছে। রাঙা শুনেছে দেশে তাদের জমিদারির আয় ছিল বছরে সাত লক্ষ টাকা। সেই আমলের পক্ষে অনেক টাকাই বটে। কিন্তু রাসমণির দোকান আর পাইকারি ব্যবসা থেকে এখন তাদের আয় আরও অনেক বেশি। আর সেটা শুধু সরযূবালার জন্যই। একটা পরিবারকে মহাপতনের হাত থেকে ওই স্থিরবুদ্ধির শান্ত মহিলাই টেনে তুলেছে। গোটা পরিবার এই মহিলাকে মেনে চলে।

মা!

সরযূবালা মুখ ফিরিয়ে তাকায়, বেরোচ্ছিস বুঝি?

আজ কাকলির জন্মদিন।

রাত কোরো না। একটা চাদর টাদর নিলে পারতে। সন্ধের পর আজকাল হিম পড়ে।

ভ্যাট। এত সুন্দর করে শাড়িটা পরলাম। এর ওপর চাদর চাপালে বিচ্ছিরি দেখাবে না? মোটেই হিম পড়েনি।

সরযূবালা আর কিছু বলল না।

মা।

সরযূবালা ফের তাকায়, কিছু বলবি?

আমি যখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে সাজছিলাম তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল।

সরযূবালা একদৃষ্টে চেয়ে বলে, কী হল?

মনে হল একটা সাদা কাপড়-পরা কেউ আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েই চোখের পলকে সরে গেল।

ঘরের জোরালো টিউবলাইটের আলোয় দৃশ্যতই সরযূবালার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ও ঘরে তোকে আর শুতে হবে না।

ও মা! কেন বলো তো!

সরযূবালা মাথা নেড়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলে, আমি আর তোকে ও ঘরে থাকতে দেব না। সারা বাড়িতে কত ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। নব জ্যাঠাদের পাশের ঘরটাতে আজই বিছানা পাতিয়ে রাখছি। শুবি।

পাগল হলে মা? তিনতলায় তো আমি বেশ আছি। আমার একটুও ভয় করে না তো!

সরযূবালাকে ক্লান্ত চিন্তিত বিষণ্ণ লাগছিল এখন। বলল, তোমার ভয় না করলেও আমার করে।

মা, একটু ভেবে দেখ। এক দিন দু দিন নয়, আমি টানা চার বছর তিনতলায় একা আছি। কখনও তো ভয় পাইনি।

তোমার প্রাণে কি ভয়ডর আছে মা? এই তো জয় সেদিনই বলছিল, মা, দিদি আরশোলা ছাড়া আর কিছুই ভয় পায় না কেন বলো তো?

ওটা তো ভিতুর ডিম। আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই ওকে ওরকম বানিয়েছ।

তোমার আদর বুঝি কম?

আমি তা বলে প্যামপার্ড নই ভাইয়ের মতো।

তর্ক থাক। আমি চাই না, তুমি আর তিনতলায় থাকো।

একটা কথা বলবে মা?

কী কথা?

কথাটা তুমি আমাকে কখনও বলোনি। আমি রাখালকাকার কাছে শুনেছি। তুমি নাকি রাসুঠাকুমার ভূতকে দেখতে পেতে।

সরযূবালা ফর্দটার দিকে চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বলল, ওদের ওরকমই সব কথা। রাখালদার ভীমরতি হয়েছে।

আর আমিই নাকি রাসমণি?

সরযূবালা বিরক্তি হয়ে বলে, জানি না। এখন যা তো! মোট কথা আজই কিন্তু আমি ছগন আর বলাইকে পাঠাব তোর বিছানা তুলে নিয়ে আসতে।

না মা, ওটা কোরো না। সাদা কাপড়ের ঝলকটা যদি রাসুঠাকুমারই হয় তা হলে

তোমাদের একটা ধারণা ভুল বলে প্রতিপন্ন হবে।

কিসের ধারণা?

তোমাদের তো ধারণা আমিই আগের জন্মের রাসমণি? রাসমণির ভূত যদি ফের দেখা দেয় তা হলে বুঝতে হবে রাসমণি আমি হয়ে জন্মায়নি!

সরযূবালা চুপ করে মেয়ের দিকে চেয়ে রইল।

আরও একটা কথা মা। রাসমণি যদি এতদিন পরে হঠাৎ ফের হাজির হয়েই থাকে তা হলে বুঝতে হবে তার কোনও জরুরি প্রয়োজন আছে।

বড্ড বাড়াবাড়ি করছো বাসন্তী।

রাসমণি তো আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি মা। বরং আমাদের অনেক উপকারই হয়েছে। আমি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই যে আজকের ঘটনাটা চোখের ভুল নয়, ওই সাদা কাপড়ের আভাসটা আসলে রাসুঠাকুমারই থানকাপড় তা হলেই বা ভয়ের কী? বরং আমার কৌতূহল হচ্ছে, ঠাকুমা আমাকে কী বলতে চায়!

ঠিক আছে, তুমি যদি দোতলায় আসতে না চাও তা হলে আমিই আজ তোমার সঙ্গে শোবো। খাটটা তো মাঠের মতো বড়, কোনও অসুবিধে হবে না।

না মা, তাও হবে না। তুমি থাকলে রাসুঠাকুমা যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে না চায়? আমার সঙ্গে তার কোনও গোপন কথা থাকতে পারে! তুমি কাছে থাকলে আসবেই না হয়তো।

সরযূবালা বিরক্ত গলায় বলল, সে বুঝি খুব ভালমানুষ ছিল! কম জ্বালিয়েছে আমাদের? বেঁচে থাকতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে, মরে গিয়েও কম পিছু লাগেনি বাবা।

তা হলে তুমি তোমার দোকানের নাম রাসমণির দোকান রাখলে কেন মা? মানুষটাকে যদি এতই ঘেন্না তোমার, তা হলে আমিই সেই রাসমণি জেনেও আমাকে এত ভালবাসছ কি করে?

আমি কি তোমাকে বলেছি যে, আমি তোমাকে রাসমণি বলে মনে করি?

বলতে হয় না মা। এ-বাড়ির কেউ কথাটা আমাকে মুখ ফুটে কখনও বলেনি, কিন্তু গুঞ্জনটা আমার কানে আসে। আমি টের পাই।

তা যদি হয়েও থাকো তা হলেও রাসুপিসি আর তুমি তো এক নও। তার জীবন আলাদা, তোমার জীবন আলাদা। এখন এসো গিয়ে। দেরি করে বেরোলে ফিরতে দেরি হবে।

রাঙা বেরিয়ে পড়ল। মুখে একটু দুষ্টুমির হাসি। তার বুদ্ধিমতী ব্যক্তিত্বময়ী মাকে জব্দ করা বড় সহজ কাজ নয়। আজ একটু জব্দ করতে পেরে তার বেশ খুশি-খুশি লাগছে। আসলে সে মাকে ভীষণ ভালও বাসে। কিন্তু মা সবসময়ে এত সিরিয়াস, এত গোমড়ামুখ যে, ওই কঠিন আস্তরণটাতে মাঝে মাঝে একটু আধটু আঘাত করতে ইচ্ছেও করে। ফিরে এসে সে আজ মাকে খুব আদর করবে।

কাকলির বাড়িতে আজ অনেক লোক। বন্ধুরা তো আছেই। তা ছাড়া কয়েকজন অচেনা ছেলে আর মেয়েকেও দেখতে পেল রাঙা। এ শহরের সকলেই তার চেনা বা মুখচেনা কিন্তু এই চার-পাঁচজনকে সে আগে কখনও দেখেনি। কয়েকটা চেয়ারে, ঘরের কোণের দিকে তারা বসেছিল চুপচাপ। রাঙা বড় হলঘরটায় ঢুকতেই একটা হল্লোড় উঠল, রাঙা এসেছে! রাঙা এসেছে!

কাকলি এসে তার হাত ধরে বলল, বড্ড দেরি করলি মুখপুড়ি। তুই না এলে জমে? শিগগির গান ধর।

রাঙা এ শহরের এক নম্বর গায়িকা। সব ফাংশনে তাকে গাইতে হয়। সুতরাং সে তৈরি হয়েই এসেছে। ব্যাগ থেকে গানের খাতা বের করে সে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গেল। তবলায় তার অনেকদিনের সঙ্গতকার সেই তন্ময়।

পরপর খান সাতেক গান গেয়ে যখন দম নিচ্ছে তখন ঘরের কোণ থেকে অচেনা ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে একজন একটু মোটাসোটা চেহারার ছেলে উঠে এসে সামনে দাঁড়াল, আপনে তো বড় ভাল গান করেন! গলায় জোয়ারি আছে।

রাঙা একটু হাসল। প্রশংসা পেয়ে সে অভ্যস্ত।

ছেলেটা করুণ মুখ করে বলল, আমিও গান করি। ঢাকা রেডিওতে মেলা প্রোগ্রাম করছি।

কথায় সুস্পষ্ট বাঙাল টান লক্ষ করল রাঙা। বলল, কী গান আপনি?

মেইনলি ভাটিয়ালি আর ভাওয়াইয়া, দমের গান করি।

বাঃ, তাহলে শোনান না। আপনি একজন রেডিও আর্টিস্ট আর চুপচাপ বসে আছেন!

ছেলেটা করুণ মুখে মাথা নেড়ে বলে, ইচ্ছা করে না, বুঝলেন? গান গাইতে হইলে মনটায় একটু আনন্দ থাকা লাগে। দ্যাশের যা অবস্থা, আমরা তো পলাইয়া আইছি। গলায় গান ফুটবে না।

কেন, কী হয়েছে আপনার?

শোনেন নাই? ইস্ট পাকিস্তানে শয় শয় মানুষরে মাইরা ফালাইছে!

ও হ্যাঁ, খুব খারাপ অবস্থা নাকি?

কওনের না। আমরা তো পলাইছি। কিন্তু সকলে তো পারে নাই। মরত্যাছে, আমার আব্বাজান মাটি কামড়াইয়া পইড়্যা আছে। তার কোনও খবর নাই।

মনটা খারাপ হয়ে গেল রাঙার। কত বয়স হবে ছেলেটার! বড়জোর সাতাশ আঠাশ। এই বয়সে একজন উদীয়মান গায়কের এ কিরকম দুরবস্থা!

কাকলি এসে বলল, তোর সঙ্গে পরিচয় করানো হয়নি। ওর নাম আবুল কাদের। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে তাড়া খেয়ে। আমাদের কেমিস্ট্রির প্রফেসর রউফ সাহেবের বাড়িতে এসে উঠেছে। মন খারাপ করে থাকে বলে আমি ওদের আজ নেমন্তন্ন করে এনেছি। কী অন্যায় বল তো, বাঙালি হয়ে জন্মানোটা কি অপরাধ?

রাত্রিবেলা খাওয়ার টেবিলে একটা থমথমে ভাব। রাঙা বাবা, কাকা আর নবদাদুর কাছে ঘটনাটা বলছিল। দেখা গেল তারা সবাই পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার কথা জানে।

বাবা বলল, আমাদের গ্রামের বাড়িটা তো আমরা বিক্রি করিনি। এস্টেটের কর্মচারি গফুর মিঞা বাড়িটা আগলে রেখেছিল। পরশুদিন শুনলাম, সেখানে মিলিটারি ক্যাম্প হয়েছে। বাড়ি দখল করে তারা জিনিসপত্র লুটপাট তো করেছেই, গফুর মিঞা আর তার ছেলেদের দিয়ে নাকি বেগার খাটিয়ে মারছে, মারধর করছে। শেষে হয়তো মেরেই ফেলবে।

দেশের প্রতি তার বাপ-কাকার যে গভীর টান আছে সেটা রাঙার নেই ঠিকই, তবে কথাটা শুনে আজ তারও একটু কষ্ট হল। দেশের বাড়ি সে দেখেনি, কিন্তু অনুপুঙ্খ বিবরণ বহুবার শুনেছে। উঁচু দেওয়াল আর পাম গাছে ঘেরা দশ বিঘে জমির ওপর ছিল তাদের দোতলা বিরাট বাড়ি। তার দুটো মহল। সামনের দিকে কাছারিঘর, বৈঠকখানা, নাচঘর, চাকরদের থাকার জায়গা, আর ভিতরের দালানে অন্দরমহল। অনেকবার বাড়িটাকে মনশ্চক্ষে কল্পনা করে নিয়েছে সে। তেমন টান না থাকলেও, ওটা যে তাদের পূর্বপুরুষদের ভিটে সেটা তো অস্বীকার করা যায় না, দেশভাগ না হলে সেও তো আজ এই বাড়িতেই থাকত!

বাবা হঠাৎ বলল, তর বলে আইজ সন্ধ্যাবেলা কী একটা হইছে! তর মায় কইতাছিল!

রাঙা হেসে বলল, চোখের ভুলই হবে। ওটা কিছু নয়।

তর একলা ওই ঘরটার মইধ্যে থাকনের কাম কি?

না না, আমি ভয় টয় পাইনি। ভূত নয় বাবা, ভয়ের কিছু নেই।

বুইঝ্যা দেখিছ, তর মায় তো একসময় রাসুপিসির ভূতরে দেখত।

রাঙা হেসে বলল, তোমাদের তো ধারণা আমিই সেই রাসমণি, রাসমণি যদি আবার জন্মে থাকে তাহলে তার ভূতের তো অস্তিত্ব থাকার কথা নয়।

কাকা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার বলল, কাউরে লগে লইয়া শুইলেই তো হয়। তর কাকিমা গিয়া শুইব তর লগে?

আচ্ছা কাকু, তোমরা কী বলো তো! মানুষ তো কত ভুলটুল দেখে। এত টেনশনের কী

আছে? মাকে বলেই বড্ড ভুল হয়ে গেছে দেখছি।

কাকা আর কিছু বলল না, তবে চিন্তিত মুখে বসে রইল।

দুই

রাতে ঘরে শুতে এসে কিছুক্ষণ আয়নার সামনে চুপ করে বসে রইল রাঙা। মনটা খারাপ লাগছে, সবসময়ে মন খারাপের কারণটা ধরা যায় না। হয়তো একটা কারণ নয়, অনেকগুলো ছোট ছোট কারণ মিলিয়ে মনটা মেঘলা হয়ে থাকে। সে একটু সচেতনভাবেই বসেছিল। পিছনে কি সাদা ঝলকটা ফের দেখা দেবে? দিক না। যদি সত্যিই ভূত আসে, রাসমণির ভূত, সে তো ভয় পাবে না, সে কথা বলবে।

বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল রাঙা। ঘষে ঘষে খুব যত্ন করে মুখে ক্রিম মাখল। চুল আঁচড়াল ভাল করে। মুখখানা মন দিয়ে দেখল অনেকক্ষণ।

যখন শুতে যাবে বলে মশারিটা তুলেছে ঠিক সেই সময়ে তার পিছনে একটা স্পষ্ট দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল রাঙা। ঘর ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই, আবার কি মনের ভুল? হয়তো বাইরের ঝটকা বাতাস জানালা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে শব্দটা তুলেছে! হতেই পারে।

আচমকা দেওয়ালে রাসমণির ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই রাঙা প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে যাচ্ছিল। এ কী! রাসমণির ছবির দুটো চোখ ওরকম জ্বলন্ত আর জীয়ন্ত হয়ে উঠেছে কেন? তীক্ষ্ণ সাঙ্ঘাতিক দুটো চোখ যেন ফুটো করে ফেলছে তাকে! পর মুহূর্তেই আবার ছবির চোখ ছবি হয়ে গেল।

বুকটা ধকধক করছে রাঙার। এসব বোধহয় তার মনের কল্পনা। সন্ধেবেলা ওই থানকাপড়ের কলক তার মনের মধ্যে বাসা করে আছে। আর তাই থেকেই এসব জটিল কল্পনা তার চারদিকে দৃশ্য আর শব্দ তৈরি করছে।

জল খেয়ে সে শুকনো গলাটা একটু ভিজিয়ে বিছানায় ঢুকে পাতলা কাঁথাখানা গায়ে টেনে নিয়ে বেডসুইচ টিপে আলো নিবিয়ে দিল। আজ কি ঘুম আসবে তার?

ঘর অন্ধকার আর নিঃশব্দ হয়ে গেল। নিঃসাড়ে শুয়ে রইল বাসন্তীরাঙা। তার কি ভয় করছে? তার কি একা লাগছে? তার কি মা বা কাকিমা কাউকে ডাকা উচিত?

মাথাটা কিছুক্ষণ গরম রইল। তারপর কখন নিজের অজান্তে চোখে ঘুমের ভার নেমে এল।

রাত কত হবে কে জানে, বুকে একটা চাপ টের পেতেই ঘুম ভেঙে গেল তার। বুকের ওপর কে একটা ঠাণ্ডা হাত চেপে ধরে আছে?

কে? বলে রাঙা চিৎকার করে উঠল।

হাতটা সরে গেল আচমকা।

রাঙা এক ঝটকায় উঠে বসে বলল, তুমি কে?

একটা মৃদু ফোঁপানির শব্দ শোনা যাচ্ছে নাকি? কেউ কান্না চাপবার চেষ্টা করছে? হাত বাড়িয়ে সে বেড সুইচটা খুঁজছিল।

কে যেন চাপা গলায় ধমক দিল, বাত্তি জ্বালাইছ না হারামজাদি।

হারামজাদি! তাকে কেউ এসব গালাগাল দেয়নি কখনও। ভারি অবাক হয়ে রাঙা বসে-যাওয়া গলায় বলল, কে তুমি?

অখন আমি কেডা না? আমার রাইজ্যপাট, খাট পালঙ্ক দখল কইরা আছছ, আমার সর্বস্ব মুইঠের মইধ্যে পাইছছ, অখন আমি কেডা, না? নিমকহারাম, পোড়ারমুখি, বজ্জাত, লজ্জা করে না জিগাইতে?

সে শুনেছে তার বদমেজাজি দুর্মুখ রাসুঠাকুমা এরকমভাবেই গালাগাল করত লোককে। তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার বাবা আর দাদারা অবধি ভয় পেত তাকে। বাড়ির বউরা থাকত শতহস্ত তফাতে।

খুব নরম গলায় রাঙা বলল, তুমি রাসুঠাকুমা?

নির্বইংশার মাইয়া, গর্ভস্রাব, তগো সবগুলিরে যদি চাবাইয়া খাইতে পারতাম তবে জ্বালা জুড়াইত।

আচমকা জ্বর ছাড়ার মতো ভয়ডর উড়ে গেল রাঙার। সে খুব স্বাভাবিক বোধ করতে লাগল। হ্যাঁ, এ রাসমণি। এবং ভূত। ভূত যদি থেকেও থাকে তবে তাও একটা এনটিটি, একটা অন্য ধরনের অস্তিত্ব। সুতরাং তাকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। সেই সঙ্গে এত গালাগাল খেয়েও, কেন কে জানে, ওই বালবিধবা রাসুঠাকুমার ওপর তার রাগ হচ্ছে না তো! মায়া হচ্ছে।

সে একটু আদুরে গলায় বলল, তুমি আমার রাসুঠাকুমা। সবাই বলে আমি ঠিক তোমার মতো দেখতে।

আমারে বশ করতে চাস হারামজাদি?

রাগ করেছ। কেন ঠাকুমা? আমি তোমার কোনও ক্ষতি করিনি! তোমার একগাদা গয়না মা আমাকে দিয়েছিল। আমি সব ফিরিয়ে দিয়েছি। তুমি যদি চাও তোমার খাট পালঙ্ক ঘর সব আমি ছেড়ে দেব। বুঝেছ?

এই শয়তান, তর বাপ ঠাকুর্দা কোন ঘটির দ্যাশে জন্মাইছিল রে, তুই যে বড় কটর কটর কইরা কইলকাতার বুলি ছাড়তাছ? জিব্বা টাইনা ছিড়া ফালামু। ক্যান, দ্যাশের ভাষা মুখে ফোটে না? ইত্তরে, কইলকাতার বিবি আইছে!

রাঙা হেসে ফেলে পরিষ্কার বাঙাল ভাষায় বলল, কে কয় দ্যাশের বুলি কইতে পারি না? খুব পারি, শোনবা?

শুনতাছি। ক' হারামজাদি, গয়নাগুলি তর শয়তান মায়টারে ফিরাইয়া দিলি ক্যান! পছন্দ হয় নাই বুঝি? বাপের জন্মে দ্যাখছছ ওইসব গয়না? আমার নেকলেসটার লকেটে যে হীরাখান আছে তার দাম জানছ? তগো বাড়িঘর বেচলেও দাম উঠব না।

তুমি কী গয়না ফিরত চাও ঠাকুমা?

চাইলে দিবি?

দিমু।

তাহইলে দে।

লইয়া তুমি কী করবা ঠাকুমা? তোমার কী শরীর আছে যে, গয়না পরবা?

তর খুব চোপা, না? কটর কটর কথা কইতে পারছ তো খুব! গয়না আমি পরুম তরে কে কইল? আমি বিধবা না?

মরার পরও কেউ বিধবা থাকে নাকি ঠাকুমা?

অন্ধকারে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল। তারপর সেই চাপা, ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর বলল, কী জানি, সধবাও বোঝলাম না, বিধবাও বোঝলাম না।

তুমি খুব কষ্ট পাইছ, না ঠাকুমা?

আ লো পটের বিবি, আমার কষ্টের তরা কী বুঝবি? রঙ চঙ মাইখ্যা, আচল উড়াইয়া চরতে যাছ, হোটেলে গিয়া অজাত কুজাতের হাতে ছাইভস্ম গিলছ, তুই আমার কষ্টের কী বুঝবি রে পুরুষ চাটা মাইয়ালোক?

বুঝি ঠাকুমা, একটু একটু বুঝি। আমিও তো তোমার মতোই এক মাইয়ালোক। মাইয়ালোকই তো মাইয়ালোকের কথা বোঝে।

ঢঙের কথা আর কইছ না রে কুকি। আমার দুই দুইটা ভাইয়ের বউ, দুইটা ভাইয়ের ব্যাটা বউ তারা বুঝছে? তারাও তো মাইয়ালোক, বোবাডাঙ্গর পুরুষ তো না। তারা বুঝল না ক্যান? তগো সব কয়টারে চিনি। সব শয়তান। সব শয়তান।

আইচ্ছা ঠাকুমা, শয়তান জাইন্যাও আমার মায়রে তুমি তা হইলে গয়নাগুলি দিলা ক্যান?

কারে দিমু? তর মায়টা শয়তান হইলেও আমারে ডরাইত খুব।

আর হেই লিগ্যাই তুমি মরার পর মায়রে ভয় দেখাইতা?

না দেখাইলে শয়তানে যে সব বেইচ্যা বুইচ্যা পেটায় নমঃ করত!

একটা কথা কমু ঠাকুমা?

কী কথা?

আমি কিন্তু তোমারে খুব ভালবাসি।

মিছা কথা কইছ না রে অতি সাইর‍্যা। তগো মতো মিটমিটা বজ্জাতরে আমি রগে রগে চিনি।

তোমারে ক্যান ভালবাসি জান? তোমার কষ্টের কথা যখন শুনি তখন আমার চক্ষে জল আহে।

ফের একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস। একটু চাপা কান্না। তারপর একটু চুপচাপ। তারপর ফ্যাসফ্যাসে চাপা গলাটা বলল, তখন আমার নয় বছর বয়স, বিয়া হইয়া শ্বশুরবাড়িতে গেছি। শাশুড়ি একদিন কইল, যাও তো বউ, তুমি তো ছোট্টোখাট্টো মানুষ, পাটাতনে উছঠ্যা শুকনা

বড়ইয়ের ডালাখান নামাইয়া আন। জীবনে পাটাতনে উঠি নাই। তবু শাশুড়ির হুকুমে গিয়া উঠলাম। বড়ইয়ের ডালা লইয়া লামুন কেমনে? শাড়ি সামলাইতে পারি না। পাও জড়াইয়া একেবারে উপর থিকা পড়লাম নীচে। পইড়াই অজ্ঞান। বুঝলি? ডাইন হাতের কবজি আর ডাইন পায়ের গুড়মুরা ভাঙছিল। গ্রামদেশে তো আর ডাক্তার বৈদ্য নাই। একটা ঘাটের মড়া হাতুইড়া ডাক্তার আইয়া ত্যানা জড়াই বাইন্ধা বুইন্ধা দিয়া গেল। ভাঙ্গা হাড় বেকা হইয়া জোড়া লাগল ছয় মাসে। হেই থিক্যা ডাইন হাতে জোর পাইতাম না। ডাইন পা টাইন্যা হাটতে হইত।

আহা রে।

আর ওই যে বেণু, অর ঠাকুর্দা কী করছিল জানছ?

কী ঠাকুমা?

শুনলে আমারে ঘিন্না করবি নাকি?

না ঠাকুমা, ঘিন্না করুম না। কও।

তখন বিধবা হইয়া বাপের বাড়িতে আইয়া থানা গাড়ছি। বয়সে ডাক দিছে। শরীর গরম। তগো মতো ছাড়া গরু তো আছিলাম না। কিন্তু শরীর মানে কই? বেণুর ঠাকুর্দা তখন সা-জোয়ান। রং কালা হইলে কী হয়, তার গতরখান আছিল আলিসান। আমি তার উপর নজর দিলাম। হ্যায়ও ট্যার পাইল। একদিন রাত্রকালে বলদটা আমার ঘরে ঢুকতে যাইয়া একটা জলের ঘটি ফালাইল উল্টাইয়া। আর যাইব কই, লহমায় লোক লস্কর জুইট্যা গেল। আমার বাবার রাগ তো দেখছ নাই, তর বাপ-খুড়ার মতো ম্যাদামারা মানুষ না। রাত্রে তারে জুতা দিয়া মাইরা গোয়ালঘরে আটক রাখা হইল। তিনদিন পরে তার লাশ ভাইস্যা উঠল পুকুরে।

কও কী ঠাকুমা? তারে মারল কে?

এই মাইয়া, তর লগে কী দিল্লাগি গল্প করনের লিগ্যা আইছি নাকি? আমার গয়না ফিরত দে।

আমি ফিরত দিমু কেমনে ঠাকুমা? গয়না তো আমার কাছে নাই, মায়ের কাছে। তুমি মায়ের কাছে গিয়া কও।

ওই কঞ্জুষের বেটি আমারে সোনাদানা ফিরত দিব? ওই শয়তান মাইয়ালোকরে তো খুব চিনছ, কত শাপ-শাপান্ত করছি, গাইল্যাইয়া দম ছুটাইয়া দিছি, তবু ওই নষ্ট মাগির হাভাইত্যা বেটি আমার গয়না বন্ধক রাইখ্যা দোকান দিছে!

ও ঠাকুমা, ওইসব বন্ধকি গয়না তো মায় আবার ছুটাইয়া আনছে। দোকানখানও তোমার নামেই দিচ্ছে।

আহা লো, মইরা যাই। আমার নামে দোকান দিয়া বড় উদ্ধার করছে আমারে। একটা পয়সা আমার ভোগে লাগে? বাৎসরিক শ্রাদ্ধটা পর্যন্ত করে না নিমকহারামগুলা।

অত রাগ হও ক্যান ঠাকুমা? আগে কও গয়না দিয়া কী করবা?

ফের একটা দীর্ঘশ্বাস। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা।

ফের সেই চাপা গলা যেন বিষণ্ণ এক সরোবরে ডুব দিয়ে উঠে এসে বলল, আমাগো পুকুরে যখন বড় বড় মাছ ঘুপ্পুস কইরা ঘাই মারে সেই শব্দ শুনছছ? রাইতবিরাইতে মনে হয় য্যান কেউ পুকুরে ফাল দিয়া পড়ল। কত মাছ, রুইত, কাতল, কালাবাউশ! পুকুরপাড়ে ঢেঁকিশাকের জঙ্গল, গন্ধভাদাইল্যা, খারকল, মানকচু। আম, জাম লিচু গাছে অন্ধকার হইয়া থাকে চাইরধার।

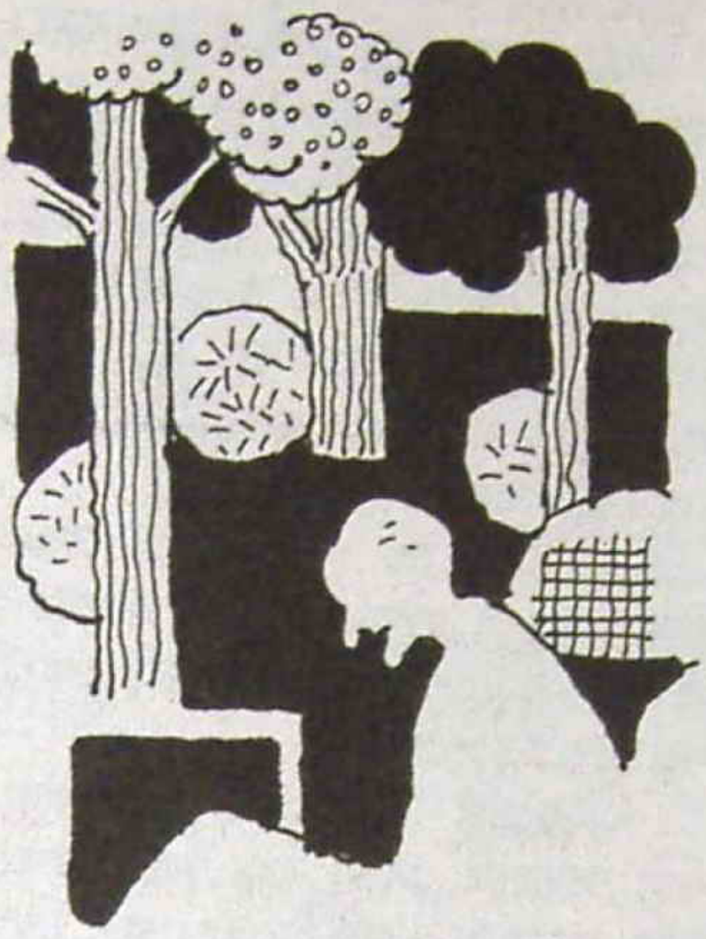

সন্ধ্যাকালে জোনাকি জ্বলে, থোকা থোকা জোনাকি, আর প্যাচায় ডাকে, আফইরা দুফইরে ঘুঘুর কান্দন শুনছছ? শোনছ নাই। মনটা উড়াল দিয়া কোনখানে যায় গিয়া। বৃষ্টি যখন লামে, তখন মনে হয় মাটি ছিদ্র হইয়া যাইত্যাছে, আর শীত! ওই কাল ঠাণ্ডা জলের উপর সর পড়ে, অখনও শেফালি ফোটে, করবী ফোটে, আম পাকে, জাম পাকে, বড় বড় জম্বুরা ঝুইলা থাকে। লোক নাই, লস্কর নাই, তবু বাড়িটা য্যান তগো লিগা বইস্যা থাকে, কান্দে। অখনও বাবা বইস্যা থাকে বাইর বাড়ির বারান্দায়। দাদু বইসা থাকে কাছারিঘরে, চাইয়া থাকে চুপ কইরা।

তারা তো মরছে ঠাকুমা!

আমিও তো মরছি। মরলে কী হয় তুই জানছ? মরলে কি সব যায় গিয়া নাকি? কত মানুষরে আৎকা আৎকা দেখতে পাই। কবে মইরা গিয়া আইজও ভিটার মায়া কাটে নাই। আহে, ঘুইরা ফিরা দেখে। পোক আছে, মাকড় আছে, ইন্দুর আছে, চামচিকা আছে, ঝুল কালি আছে, তারা আছে। ঠাণ্ডা, তব্দা-লাগা বাড়িটায় বড় শান্তি। কত মানুষ ছায়ার মতো ঘুইরা বেড়ায়, মুখে কথা নাই, চাইরদিকে হাতায় পিতায়, চাইয়া চাইয়া দ্যাখে। এই হারামজাদি, দ্যাশ দ্যাখছছ? ভিটামাটির গন্ধ কেমন জানছ? কামরাঙ্গা, করমচা, ডেউয়া, ডেফল খাইছছ জন্মে? তুই বুঝবি কেমনে? আমার মায় ঠাকুমায় অখনও দালানে বইয়া থাকে। বড় শান্তি রে!

ফের দীর্ঘশ্বাস, তারপরই গলাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, খেদা! খেদা আপদগুলিরে। বাইরইয়া বাইর কইরা দে!

ভয় পেয়ে রাঙা বলে উঠল, কারে ঠাকুমা? কারে খেদামু?

ওই যে আপদগুলি ঢুকছে! বন্দুকের কান্দা দিয়া গফুররে মারল! রহিম শেখরে নদীতে চুবাইল। বাড়িঘর ভাঙত্যাছে। লোকে ডরায়, কয়, অগো লগে কি আমরা পারি? অরা হইল মিলিটারি, খেদা! খেদা!

বলতে বলতে সেই কান্না, তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল।

ঠাকুমা! ও ঠাকুমা! গেলা গিয়া নাকি?

আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। অনেকক্ষণ বিছানায় বসে রইল রাঙা। তার সন্দেহ হল ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছে! নাকি স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ! উঠে গিয়ে চোখেমুখে জল দিল রাঙা। মাথাটা গরম। কিন্তু মনটা ভারী বিষণ্ণ লাগছে এখন।

উত্তরের জানালা দিয়ে হিম বাতাস আসছিল। তার টনসিলের একটু দোষ আছে। তবু খোলা হাওয়ায় একটু দাঁড়িয়ে রইল সে। মাথাটা ঠাণ্ডা হোক।

অনেকক্ষণ কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না সে। ঘটনাটা সত্যি, না স্বপ্ন? ভূত-প্রেত আত্মা এসব তো সে মানে না, ভয়ও পায় না। তিনতলায় বিশাল এলাকা জুড়ে সে চার বছর একা বাস করেছে। সে শুনেছে বটে তার মা সরযূবালাকে নাকি মরার পর রাসু ঠাকুমা রোজ ভয় দেখাত। সেসব তো বিশ্বাসও করেনি! তাহলে এটা কী হল?

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হঠাৎ অদেখা, প্রায় অচেনা, দুর্মুখ ওই বালবিধবা রাসমণির জন্য তার দুচোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগল।

তিন

এই হল কবি হাফিজুরের বাড়ি। পুরনো ঝুরঝুরে পোড়ো এই বাড়িতে কেউ থাকে না এখন। হাফিজুরের কোনও উত্তরাধিকারী নেই। মারা যাওয়ার পর কেউ দাবি করতে আসেনি এই বাড়ি। বিশ বছর আগে এই এঁদো বাড়িতেই একা থাকত কবি। রাঙা শুনেছে লম্বা, ফর্সা, রোগা আর সুপুরুষ সেই মানুষটার চেহারা ছিল কবির মতোই। আধময়লা পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে সারা শহর ঘুরে বেড়াত পায়ে হেঁটে। উদভ্রান্ত উদাসীন, নির্লোভ সেই মানুষটির কোনও শত্রু ছিল না। সকলেই ভালবাসত তাকে। কেউ কেউ বলে, হাফিজুর যে এ শহরে এসে বাসা বেধেছিল তা এমনি নয়, কোনও এক হিন্দু রমণীর প্রেমে পড়েছিল সে। সেই টান ছেড়ে আর নিজস্ব ভুবন রচনা করতে পারেনি হতভাগ্য মানুষটি। হয়তো মুখ ফুটে নিবেদনও করতে পারেনি তার প্রেম। হ্যাঁ, বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ বছর আগে এরকম সব প্রেম হত। আজকাল আর হয় না।

আজ ছুটির দুপুরে কোন মতিচ্ছন্ন হল তার কে জানে! রাঙা তাদের বাড়ির পিছন দিককার সুঁড়ি পথ ধরে, মাধবতলার পুকুরপাড়ের নির্জন মেটে রাস্তাটা হেঁটে পার হয়ে আজ কেন যে এই জঙ্গলে ঢাকা, শ্যাওলায় ধরা পড়ো-পড়ো বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল কে জানে! স্বেচ্ছায় নয়। সে তার মাথার মধ্যে কুয়াশার মতো ঘনিয়ে থাকা এক ঘোরের ভিতর এসব করছে। এই পরিষ্কার রোদের দুপুরেও কে একজন যেন টর্চের আলোয় অন্ধকারে পথ দেখিয়ে তাকে এইখানে নিয়ে এল। কিন্তু এখানে কোন কাজ? সাপখোপের বাসা, শিয়াল তক্ষকের আস্তানা, এখানে তাকে আনল কেন?

কিন্তু আচ্ছন্ন মাথায় কিছু না বুঝেই সে আগাছার জঙ্গল ভেদ করে ছায়াচ্ছন্ন ছোট বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই। সুনসান দুপুর। শুধু বাতাসের হু হু হাহাকার। গাছের পাতায় নির্ঝরের শব্দ। পায়ে পায়ে ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে সে অবাক হয়ে দেখতে পেল, সামনের হলঘরটায় দশ-বারোখানা মাদুর আর শতরঞ্চি যেমন তেমন করে বিছানো আছে। কয়েকটা বালিশ আর এক আধটা মাদুর বা শতরঞ্চিতে কোঁচকানো চাদরও পাতা। ঘরের এধারে ওধারে পড়ে আছে কিছু পোড়ো সিগারেটের টুকরো আর দেশলাই। পরের ঘরটা ছোট, সেটাতেও একই দৃশ্য। সারি সারি দুঃখী বিছানা, মাদুর আর শতরঞ্চি। কারা থাকে এখানে? তারা কি ভাল লোক?

না, ভয় হল না রাঙার। সে জানে সে এখানে একটা কাজে এসেছে। কী কাজ তা তাকে তো কেউ বলেনি! মাথার ওই ঘোরই আজ আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে। ওই ঘোর-ঘোর ভাবটাই তাকে এনেছে এখানে।

দুটো ঘর পার হলেই আর একটা কুঠুরি। অন্ধকার, তার কোনও জানালা নেই, ছাদ ফেটে আকাশের চিলতে দেখা যাচ্ছে। মেঝের ওপর ডাঁই হয়ে আছে ভাঙা ইঁট, ছাদের পলেস্তারা।

সে কি কিছু খুঁজছে? হ্যাঁ, কিন্তু কী তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না সে। ঘরটার মধ্যে ছুঁচোর গায়ের গন্ধ, আরশোলার নাদির গন্ধে বাতাস ভার হয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে কয়েক পা এগোল। একটা কুলুঙ্গি না? হ্যাঁ, অপরিসর, ধুলোটে একটা কুলুঙ্গি। সেখানে জুতোর বাক্সের মতো বহু পুরনো ধুলোয় ধূসর নোংরা একটা ঢাকনা খোলা বাক্স পড়ে আছে। ওপরে জমেছে পাখির বাসা, ভেঙে পড়া পলেস্তারার টুকরো, ঝুল আর কালি। হাত বাড়িয়ে সে বাক্সটা নামাল, মেঝের ওপর উপুড় করে ঢেলে ফেলল।

রাবিশে কয়েকটা পুরনো ময়লা কাগজ। তিন চারটের বেশি নয়। একসময়ে হয়তো দামী প্যাডের কাগজই ছিল। এখন আর তার জাত চেনা যায় না। ব্যগ্র হাতে কাগজগুলো তুলে নিল সে। যত্ন করে ভাঁজ করল। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগ ভরে নিয়ে বেরিয়ে এল।

বড় ঘরটায় পা দিতেই চমকে উঠল সে। সামনে নিঃশব্দে দাঁড়ানো কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলে। অবাক চোখে দেখছে তাকে। তাদের মধ্যে বেণু।

বইন, তুমি এখানে?

একটু হেসে রাঙা বলে, এখন এখানে আস্তানা গেড়েছ বুঝি? সেইজন্যই কয়েকদিন তোমার টিকির নাগাল পাওয়া যায়নি।

একটু ম্লান হেসে বেণু বলল, কী করব বলো। এরা সব খানসেনা আর রাজাকারদের তাড়া খেয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে। শহরের সব বাড়িতেই ওপার থেকে লোকজন এসে ভরে ফেলছে। তাই কবি হাফিজুরের বাড়িটাই একটু সাফসুতরো করে নিয়ে ওদের সঙ্গেই আছি। চাঁদা তুলতে হচ্ছে। নইলে ওদের চলবে কী করে?

রাঙা জানে। গত কয়েকদিন সে রেডিও শুনছে, খবরের কাগজ পড়ছে। পাকিস্তানের ভিতরে একটা বাঙালির অস্তিত্বের মরণপণ লড়াই সে টের পাচ্ছে।

ছেলেগুলোর দিকে চেয়ে দেখল রাঙা। গুণ্ডা বদমাশের চেহারা নয়। বরং খানিকটা সরল, গ্রামের ছেলে বলে মনে হয়। তাকে দেখে খুব অবাক।

সে বলল, তোমরা চলে এসেছো, কিন্তু বাড়ির লোকজন?

সামনের ছেলেটা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, জানি না বইনদি, মায়ে বাবায় কইল, ইয়ং ম্যানগুলারেই নাকি আগে ধরে, মাইরা ফালায়। তরা পলাইয়া যা। আমরা পলাইতে চাই নাই। কিন্তু লড়ুম কী দিয়া কন? বন্দুক, মেশিনগানের সামনে তো আর লাঠি সড়কি দিয়া লড়া যায় না।

আর একজন একটু এগিয়ে এসে বলল, অস্ত্র পাইলে আমরা কি ছাড়ুম নাকি বইনদি? কিন্তু মেলা দাম চায়। আমাগো টাকা কই?

বেণু বলল, বর্ডার এখন খুলে দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার লোক আসছে রোজ। আর কয়েকদিনের মধ্যে কী অবস্থা হবে তাই ভাবছি। লোকে চাঁদা দিচ্ছে অনেক, কিন্তু তাতেও তো হবে না।

রাঙা ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল। তারপর বলল, বেণুদা, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। আজ সন্ধেবেলায় বাড়ির পিছনদিককার আমগাছটার কাছে থেকো। সাতটা।

আচ্ছা। তুমি কি আমার খোঁজে এসেছিলে?

হ্যাঁ।

বলে আর দাঁড়াল না রাঙা। চলে এল।

ঘরে এসে সে ব্যাগ খুলে কাগজগুলো বের করল। পর পর সাজিয়ে রাখল টেবিলে। মোট চারটি কবিতা। কাগজ ময়লা হয়ে গেলেও পড়া যায়। প্রথম কবিতাটা এরকম :

যদি বলি মেঘের রোদ্দুর,
তা হলে হয়তো বুঝবে না।
যদি বলি দূর, বহু দূর,
শুধু দূর করেছ রচনা!

কবিতার নীচে লেখা, শ্রীমতী সরযূ চৌধুরীকে নিবেদিত দূরের কবিতা।

দ্বিতীয় কবিতাটা এরকম :

কেন এত দূর হয়ে থাকো?
মাঝখানে গাঙ ছলো ছলো
খেয়া নেই, মাঝি নেই সাঁকো,
পারাপার কিসে করি বলো!

এটারও নীচে লেখা : নীহারিকার মতো দূরবর্তিনী সরযূ চৌধুরীকে নিবেদিত।

তৃতীয়টাও সেই দূরের কবিতা :

মেঘের ভিতরে এই রোদ
যাকে বলি মেঘের রোদ্দুর,
বুঝি আর জন্মের প্রতিশোধ,
রচনা করলে শুধু দূর।

নীচে সেই সরযূ চৌধুরীকে নিবেদিত।

চতুর্থ কবিতা এরকম :

কবিতার দাস ছিলাম না কোনওদিন,
আজও দাসখৎ লেখা ওই শ্রীচরণে,
বাঁধা গাধা এক গবেট অর্বাচীন,
মুক্তি কি পাবো একেবারে শ্রীমরণে?

শ্রীমতী সরযূ চৌধুরীকে হতভাগ্য হাফিজুরের নিবেদন।

চার

আলমারির গায়ে চকচকে স্টিলের চাবিটা দুলছিল টিকটিক করে। সন্ধেবেলা দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠল সরযূবালা, সর্বনাশ! সে কি ভুলে চাবিটা এভাবেই রেখে গেছে! এত ভুল তো তার হয় না কখনও!

তাড়াতাড়ি আলমারি খুলে সে লকারটা দেখল, বন্ধ। তবু সে লকার খুলে গয়নার বাক্সটা নাড়া দিতেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল। গলা শুকিয়ে কাঠ। বাক্সটা হালকা লাগছে না?

দেড়শ ভরিরও বেশি ভারী সাবেক গয়নার নিরেট বাক্স সহজে নাড়ানোই যায় না। সরযূ বাক্সটা সাবধানে নামিয়ে আনল। তালা খুলতেই অবাক হয়ে দেখল, গয়নার চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু কয়েকটা কাগজ পড়ে আছে।

ওপরে ছোট্ট একটা চিরকুট, মা, আমার জিনিস আমি সব নিয়ে গেলাম। মানুষকে বাঁচাতে। তোমার জন্য রেখে গেলাম তোমার জিনিস। দেখবে ওর দাম গয়নার চেয়ে কম নয়। —বাসন্তীরাঙা।

হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে সরযূ ময়লা কাগজগুলো তুলে নিল হাতে। চোখে চশমা এঁটে আলোর নীচে পড়তে লাগল।

পড়তে অনেক সময় লাগল সরযূর। দুখানা চোখ ধীরে ধীরে বর্ষার দীঘির মতো কানায় কানায় ভরে উঠল। তারপর উপচে টসটস করে পড়তে লাগল তার কোলে।